তারিখ: ১৮·SEP·2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

যুগান্তর

বাহালুল মজনুন চুন্নু

শিক্ষা দিবস নিয়ে বাকি কথা

গতকাল শিক্ষা দিবস উপলক্ষে কিছু লেখা পড়েছি। শিক্ষা মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, আবার দক্ষ মানবসম্পদেও পরিণত করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত না হলে নাগরিকদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার স্ফুরণ ঘটে না। শিক্ষা নাগরিকদের বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী এবং অধিকার ও কর্তব্যসচেতন হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে সামষ্টিক শিক্ষার বিকাশ। এজন্য শিক্ষাকে রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে সত্তরের নির্বাচনী ভাষণে তিনি যে বক্তব্য দেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না।' শিক্ষা যে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ এই বিষয়টিকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ থিয়োডর শুলজ। তিনি দেখিয়েছেন সরকারিভাবে যে কোনো সেক্টরে বিনিয়োগের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জিত হয়। শিক্ষায় 'রেট অফ রিটার্ন'-এর বিষয়টি নিয়ে তিনি ১৯৬১ সালে তথ্য-প্রমাণ হাজির করে বিশ্বের প্রতিটি সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারা যেন তাদের নাগরিকের শিক্ষার পেছনে আরও বেশি করে অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু তার আহ্বানকেই যেন বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে তার পরের বছরেই তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের শরীফ কমিশন শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এর প্রতিবাদে রাজপথ কাঁপিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল এই বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষ। রক্তে রঞ্জিত রাজপথের ওপর দিয়ে প্রতিবাদী জনতার লাশ মাড়িয়ে স্বৈরাচারী সরকার তাদের বাণিজ্যিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি সেদিন। এটা ছিল বাঙালির বিজয়, প্রতিবাদী চেতনার বিজয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিজয় জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা, শাণিত করেছিল জাতীয়তাবোধের চেতনা।

একটি জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে তার শিক্ষানীতিকে দুর্বল করে দিলেই হয়। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা সেটা চেয়েছিল। এর জন্যই তারা বাণিজ্যিক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছিল তৎকালীন শিক্ষাসচিব এসএম শরীফের নেতৃত্বে। সেই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যই ছিল এই বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের মাঝে যেন নাগরিক চেতনার বিকাশ না ঘটে। তারা যেন মুখ বুজে সহ্য করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে তার 'ডাউনওয়ার্ড ফিল্টারেশন মেথড' তথা চুঁইয়ে পড়া নীতি অনুযায়ী ধনীদেরই কেবল শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তার সেই নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ঠিক তার একশ সাতাশ বছর পর আবারও সেই নীতিই ভিন্নরূপে এদেশের মানুষের কাছে হাজির করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। পাকিস্তানিরা শরীফ কমিশন প্রণয়ন করে চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ক্ষমতার মসনদ দখল করে রাখুক, আর পূর্ব পাকিস্তানিরা শিক্ষার অভাবে আজীবন তাদের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করুক। কিন্তু তাদের সেই দুরাশা পূরণ হতে দেয়নি এই বাংলার সংগ্রামী মানুষ। তাই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমেই জাতিসত্তার জাগরণের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের মাত্র চুয়ান্ন দিন পর তার এক সময়কার আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তৎকালীন শিক্ষা সচিব এসএম শরীফের নেতৃত্বে এগারো সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করে। সেই কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হলে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর কারণ শিক্ষাসংকোচন নীতিসহ দুরভিসন্ধিমূলক বেশকিছু ঘৃণ্য সুপারিশ। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, বাংলা বর্ণমালায় না লিখে আরবি অথবা রোমান বা উর্দু বর্ণমালায় লেখার সুপারিশ করা হয়। একইসঙ্গে বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের সুপারিশও করা হয়। এর ফলে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির অর্জিত ফলাফলকে তারা সুকৌশলে ধূলিসাৎ করার পাঁয়তারা করে। সেই সময় ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স দুই বছরে সমাপ্ত হতো। কিন্তু এই রিপোর্টে ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করার সুপারিশ করা হয়, যাতে গরিব ছাত্ররা বাধ্য হয়ে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রুটিরুজিতে নেমে যায়। এই রিপোর্টের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হল এর বাণিজ্যিকীকরণ। রিপোর্টে শিক্ষাকে 'অধিকার' হিসেবে না দেখে শিক্ষাকে 'বাণিজ্য' হিসেবে দেখা হয়েছিল। রিপোর্টে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা'কে অসম্ভব বলা হয়। এতে বলা হয়, 'সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের (জনগণের) যে ভুল ধারণা রহিয়াছে, তাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন দাম, তেমন জিনিস— এই অর্থনৈতিক সত্যকে অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার ব্যাপারেও তেমনি এড়ানো দুষ্কর। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।' রিপোর্টটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সব ক্ষেত্রেই বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছিল। এমনকি জাতি যেন উচ্চশিক্ষিত না হয় সেজন্য রিপোর্টটিতে বলা হয়েছিল, 'প্রাথমিক স্কুলই আমাদের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের শিক্ষাজীবনের শেষ সোপান হইবে।' তাছাড়া রিপোর্টটি ছিল সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ। এমন শিক্ষা সংকোচনমূলক ও বাজে রিপোর্টটিকে বাংলার জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্ররা মেয়াদ বৃদ্ধিকে মেনে নিতে না পারায় আন্দোলনে নেমে পড়ে। তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ)-এর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সবাই মিলে 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' নামে একটি ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে এই ব্যানারে আন্দোলন, মিছিল, সভা-সমাবেশ, ধর্মঘট চলছিল। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো সমন্বিতভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। তারা শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলসহ মোট এগারো দফা দাবি আদায়ের ঘোষণা দেয় ২ আগস্ট। দাবি আদায়ের জন্য ১৫ আগস্ট সারা দেশে ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করে। সেদিনের অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এতে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে পাকিস্তানি সামরিক শাসক। তারা নির্যাতন শুরু করে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর। এতে ছাত্ররা দমে না গিয়ে আরও শতগুণ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেন ছাত্রদের নানা দিকনির্দেশনা দিয়ে। ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন। ছাত্রদের লড়াকু মনোভাব দেখে স্বৈরাচারী সরকার ১০ সেপ্টেম্বরের ডাকা অবস্থান ধর্মঘটের স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিল সেদিন। কিন্তু তাদের দাবি মানা হয়নি। একদিকে সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অন্যদিকে চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল এবং গণমুখী শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করেছিল। ওইদিন সকাল দশটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের দিক থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। ছাত্রদের আন্দোলন হলেও দেখা যায় এই মিছিলে মেহনতি মানুষের উপস্থিতি ছিল পঁচানব্বই শতাংশেরও বেশি। দিনমজুর, গৃহশ্রমিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ছাত্রদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মিছিলে জমায়েত হয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সামরিক শাসন এবং তাদের নির্মম শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে গিয়েছিল পুরো ক্যাম্পাস। মিছিল শুরু হয়ে নবাবপুরের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ হাইকোর্টের সামনে বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা সংঘাতে না গিয়ে আব্দুল গনি রোডের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ মিছিলের পেছন থেকে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষণ শুরু করে। এতে বাবুল নামের একজন ছাত্র, বাস কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা ও গৃহকর্মী ওয়াজিউল্লাহ নিহত হন। পুলিশের এই আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দেশই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, রাজপথ হয়ে উঠে রণক্ষেত্র। টঙ্গীতে সুন্দর আলী নামের একজন শ্রমিক নিহত হন। আর সারা দেশে আহত হন হাজারেরও বেশি লোক। ছাত্র, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণের অভূতপূর্ব সেই আন্দোলন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন। সেই দিনের হরতাল ছিল আইয়ুব খানের আমলের প্রথম হরতাল। সেই হরতাল সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল ছাত্র-জনতার মেলবন্ধনের কারণে, প্রতিবাদী চেতনার কারণে। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিবাদী ছাত্ররা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'স্যার, এরা লড়াই করছে, গুলি খাচ্ছে আর আমরা ঘরে বসে বিবৃতি দিচ্ছি। এদের সেন্টিমেন্টকে তো বুঝতে হবে'। অতঃপর সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন। সামরিক সরকার বাধ্য হয়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের কাজ স্থগিত ঘোষণা করে।

> এই রিপোর্টে ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করার সুপারিশ করা হয়, যাতে গরিব ছাত্ররা বাধ্য হয়ে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রুটিরুজিতে নেমে যায়। এই রিপোর্টের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হল এর বাণিজ্যিকীকরণ। রিপোর্টে শিক্ষাকে 'অধিকার' হিসেবে না দেখে শিক্ষাকে 'বাণিজ্য' হিসেবে দেখা হয়েছিল। রিপোর্টে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা'কে অসম্ভব বলা হয়। এতে বলা হয়, 'সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের (জনগণের) যে ভুল ধারণা রহিয়াছে, তাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে।'

দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। সরকারি কোষাগারে তেমন কোনো অর্থ না থাকায় এই জাতীয়করণের পদক্ষেপটি ছিল সত্যিই দুঃসাহসিক এবং এই দুঃসাহস কেবল বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই দেখানো সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি আমলের শিক্ষা কমিশনগুলোর সংকোচন নীতি থেকে বেরিয়ে এসে গণমুখী শিক্ষা কমিশন গঠন করেন ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে। সেই কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী আধুনিক ও গণমুখী এবং বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু ছিয়ানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রতিটি সরকার 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতির বাস্তবায়ন করে শরীফ কমিশন, হামিদুর রহমান ও নূর কমিশনকেই যেন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ভঙ্গুর শিক্ষাকাঠামোকে নানা প্রতিকূলতা এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন, সেরকম একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে ব্যাপৃত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের শিক্ষার অধিকার এবং গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, যুগোপযোগী, প্রগতিশীল শিক্ষানীতি উপহার দেন জাতিকে। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে পুরোদমে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দেশে সাক্ষরতার হার বাহাত্তর শতাংশ। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্যের কোঠায়। আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হচ্ছে। তবু শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও রয়ে গেছে কিছু সংকট। হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করে, শিক্ষা দিবসের মাহাত্ম্যকে ধারণ করে সেসব সংকট মোকাবেলায় সব অংশীজনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় জ্ঞানের আলোয় প্রজ্বলিত হবে দেশ, সেই প্রত্যাশাই আমাদের সবার।

বাহালুল মজনুন চুন্নু : *সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ*